বং ঢং ডট কম্
www.bongdhong.com

তিন্তিড়ি গাছের ফল

মৈত্রেয়ী কুমার

এক ফালি মেটে চাঁদটা যখন তেঁতুলগাছের মাথায় চড়ল, হুঁকা হাতে দাওয়া থেকে আনমনে নেমে এল ভুতো। ময়না তখন কাঠের জ্বালে নাকানি চোবানি খাচ্ছে। জ্বাল ধরলে ভাত বসাবে। আজ কিছু ডাল জুটেছে এক ছটাক মহাজনের ঠেঙে। শুকনো লঙ্কা ফোড়নে ওই রেঁধে নেবে। ছেলে মেয়ে দুটো এখনি ঢুলছে পড়ার বই কোলে, কত্‌খন টানবে কে জানে! বাঁশের নলে জোরে জোরে ফুঁ দিয়ে আঁচ উস্কায় ময়না।

লাগাতার গর্মি চলছে। মাঠ ঘাট শুকিয়ে খড়। মেঘের আশায় থেকে থেকে গোটা গাঁয়ের মানসের চোখে চালসে পড়ার দশা। ফণিমনসার ঝোপে পাছে পরণের ধুতিতে ফাঁস ধরে, তাই আলগোছে পা ফেলে ভুতো। খুব সন্তর্পণে ডাকে, "মা! মা রে! আচিস?"

চাঁদের আলো চুঁইয়ে নামে তেঁতুলপাতায়, ডালে। গাঁয়ের দক্ষিণের রক্তদহ বিল থেকে দমকা হাওয়া ছুটে আসে। হা হা হা হা। তেঁতুলপাতায় আওয়াজ ওঠে সর সর সর সর। "বাঁপ ভুঁতো! আঁটকে থাঁক, ঝাঁ কঁরার কঁর। হাঁলচাঁল এঁধেরে সুঁবিদের নঁয়কো।"

ভুতো একটা সমাধানের আশায় এসেছিল। যারপরনাই বিরক্ত হয়ে বলল, "কেনে? তোদের আবার সমস্যাটা কী? এখেনে আমার জেবনডা যে উজার হই যাচ্ছে, তার কিচু আন্দাজ আচে তোর কাচে?"

তেঁতুলতলা ঘন হয় অশরীরীর দীর্ঘশ্বাসে। "বাঁপ রে, তঁরা হঁলি খাঁনদানী চাঁষা। খঁরা জঁলে ভঁয় কঁরলি তঁদের চঁলে নাঁ। গঁরুর ন্যাঁজখান্ মুঁচড়োতে মুঁচড়োতে লাঁঙ্গলের বাঁট শঁক্ত হাঁতে ধঁরতি পাঁরাটা চাঁট্টিখান কঁতা নাঁ। কঁতায় কঁতায় যঁদি তঁরা এঁকবার বিঁদেয় দেঁ মাঁ ঘুঁরে আঁসি বঁলি এঁধেরেতে ভিঁড় জঁমাবি তঁ আঁমরা কোঁথা যাঁব বাঁপ?"

দুঃখিত হয়ে ভুতো বলে, "মা, জেবন সুখির হলি মরতি চায় কোন শালা? যে লোকের মুখে অন্ন যুগাই তারাই পোঙায় বাঁশ দেয়! দু একদিনে বিষ্টি হলে ভাল, নয়তো ধান চারাগুলো খড় হবে আর মহাজন সিদে তো কাটবে, আড়ায়ও কাটবে। তার উপর শহর থিকে হাজির হইচে কতকগুলা যমদূত! না কি সরকারি চামচা। তারা হুমকি দেয়, গুম খুন করে, বলে জমি দে! আররে, বাপ পিতেমোর জমিটুক্ — দে বললি দি কি করি বল্‌দিনি!"

ক্ষেন্তি দাওয়া থেকে চেঁচায়, "বাবা, বাবা গো! মা খেতি দিচে। এসো শিগ্গির।"

মুখ বাড়িয়ে ভুতো বলে, "ঝা, আসতিচি!"

অশরীরী স্বর করুণ হয়। "বাঁপ রেঁ। ধঁয্যি ধঁর। হাঁকপাক ভাঁলো নঁয়। তঁর বাঁপেরে আঁজও দেঁখি ভুঁলের প্রাঁচিত্তিরে লঁটকে আঁচে। মুঁক্তি নাঁই। বাঁপ, মঁগজের মাঁটিতে নোঁনা ধঁরিচে, ঝাঁ, দুঁটো দুঁটো খেঁয়ি নিঁগে ঝাঁ!" মায়ের স্নেহে ভুতোর চোখে জল আসে। ধুতির খুঁটে চোখ মুছে সে ভিতর বাড়ি যায়।

ভুতোকে দেখেই ময়না ফুঁসে ওঠে। দরদরে ঘাম মুখে বলে, "কালই যাচ্ছি আমি দাশুরথির থানে। ওজার হাতের বাড়ি না খেইল্যে বুড়ির তেঁতুল বিচির নোভ যাবে নে!"

ভুতোও তড়পায়। "এ্যাঁহ! দু দণ্ড কি হুঁকা করতি গেচি, এত্ত কতা কোস! দে দে, ঝা দিবি দে!"

বাপের কোলে হামলে আসে তিন বছরের খোকা। "বাবা, এট্টা ব্যাগ কিনে দে না! বাবলুর ঝেমন, ছোটা ভীম ব্যাগ!" আহ্লাদে মুখ ডগমগ হয় তার।

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

ক্ষেন্তি ভাতের দানায় শুকনো ডাল লঙ্কা টিপে মাখে। বলে, “বাবলুরা বড়নোক। ওদের থাকতিই পারে, না বাবা?”

“হবে, হবে!” ছেলেকে সামলে মেয়ের মাথায় স্নেহের হাত রাখে ভুতো। মেয়ে হাসে। “বাবা, বিষ্টি হলি পরে আমারে এট্টা লাল জরি ফ্রক আর মালা এনে দিও সদর থে!”

ময়না খিঁচিয়ে বলে, “অ্যাই, থাম দিনি! ল্যাখাপড়া নাই, শুদু এই চাই, ওই চাই!”

মেয়ের মুখ কালো হয়ে আসে। ভাতটুকু পাতে ফেলেই উঠে যায়। বিরক্ত হয়ে ভুতো বৌকে বলে, “দিন রাইত তোর এই খিচির মিচির খিচির মিচির ভাল্লাগে না আর!”

ময়না দমে না। মুটো ক’টা ভাতে লঙ্কা আর তেঁতুল-ক্বাথ ডলে মাখে। পাতে আঙুলের ঠোকা মেরে বলে, “ঝা করতি পারবো না, তার শর্ত দিব ক্যানো? আইজ ঝদি ওদের মুকের ’পর সইত্যটা বলি দাও, ওরা কানবে। তা কাঁদুক! তবু ঝানবে বাপ অসমত্থ, পারবেনি!”

ভুতো আলগোছে জল খায়। “ঠাকুর মেইরে রেকিচে ঝারে, তারে বাঁচায় কে?” বলে উঠে পড়ে। সোয়ামীর ব্যথার জায়গাটা ময়না বোঝে। তাই কথা না বাড়িয়ে এঁটো কেড়ে রান্নাঘর ধুয়ে দেয়। এত রাতে পুকুরধারে বাসন ধোবে না। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ভুতো ভারি আনমনে হুঁকো হাতে ঘরে যাচ্ছে।

আগে খাওয়া দাওয়া মিটলে হুঁকো টানতে দাওয়ায় বসত ভুতো। সাংসারিক টুকিটাকি কথার ঝুলি নিয়ে মুখে পান গুঁজে পাশে এসে বসত ময়না। রক্তদহ বিলের জলভরা মিঠে বাতাসে শরীরের নোনা ঘাম জুড়িয়ে যেত। কখনো বা উঠোনের আড়ে ওই ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছটা দেখিয়ে আবদেড়ে গলায় বলত, “কাল দেকোদিনি দুটো পাকা তেঁতুল! পান্তাভাতে ডলি দিব। শাউড়ি এমুন অব্যেস করি গেচেন, বিনা তেঁতুল পান্তা মুকে রোচে না।”

আজকাল ওদের গ্রামে যেন শনির দৃষ্টি লেগেছে! শয়তানের চর নেমেছে। তারা যেখানে সেখানে হাতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দোকান, আড়ত, চণ্ডীমণ্ডপ তো বটেই, এমন কি গৃহস্থের উঠোনেও ঢুকে আসছে। তাদের হুমকি — “ট্যাকা নে, চাষজমি সরকারের নামে লিকে দে! শহুরে চলি ঝা, নয়তো ঠুঁটো হয়্যি দাওয়ায় বসি থাক।” আজ সপ্তাহ দশদিন ভুতোর পিছনে লেগেছে ওরা। ময়নার দিকে কুনজর ফেলছে। রোজ রাতে ভয়ে আধমরা থাকে ভুতো। এক লাথি পড়লে তার তালকাঠের দরজা কি পারবে চাষিঘরের আব্রু বাঁচাতে?

সারারাত ঘরে রেডির তেলের লণ্ঠন জ্বালিয়ে রাখে ময়না। আঁধারে ডর লাগে বেশি। তেল যা আছে তাতে দিন দুই যাবে। তাদের গেরামে সবার সামত্থ কই তারের লাইন নেবে? চুরি চামারি করে অনেকে নিছে, কিন্তু ভুতো? ধম্মপুত্তুর!

শুয়ে শুয়ে চাল ফোঁড়া আকাশের তারা দেখে ময়না। কত স্বপ্ন ছিল! দশ বিঘা ধানি জমি ছিল এদের। তাই খপর পেয়ে বাপ বিয়ে দিল। কী, না খানদানী চাষাঘর। দুধে ভাতে থাকবে মেয়্যে! কপাল! নইলে সোয়ামী-শ্বশুর তার মেহনতি তো বটে! শাউড়ির মুখে শুনেচে ময়না, শউর মরিচিলো অপঘাতে। জন্মইস্তক জমির মাটি মেখে বড় হয় যে চাষা, সব সইতে পারে, পারে না শুদু প্রকৃতির খামখেয়ালির চাঁটার উপর বড়নোক মানুষের রক্তচোষা স্বভাব।

ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে পাশ ফিরে শোয় ময়না। জানতে পারে না, তক্তপোষের উপর নিদ্রাহারা দুটো চোখে নির্নিমেষ ভাবনায় ডুবে আছে ভুতোও।

“রাতের আকাশ কি নিরীহ দ্যাকোদিনি,” ভুতো ভাবে। “ঝেনো পিথিমির কোন কাণ্ডই চোখে পড়ে নে তার! কেমন সোন্দর, তারাদের ছ্যানাপোনা বুকে নে, দিব্যি সেইজে গুইজে আচে!”

ওই আকাশটার মতই পরিপূর্ণ ছিল ভুতোদের ছেলেবেলা। অসুর মাফিক খাটত বটে বাপ-ঠাকুর্দায়। ছুটির দিন বলে কিছু নাই। বীজ বোয়া, ধান কাটা, নিড়নো, ধান কাড়াই, মড়াই বাঁধা। ফসলের সময় না থাকলে তারা যেত মাছ ধরতে। তা বাদে বেত বুনত। কিছু না হোক খড় দিয়ে চাল ছাউত, কুঁড়ের তালকাঠের কড়ি বরগায় আলকাতরা মাখাত। “গোলাভরা ধান, মাছভরা পুকুর, ফলপাকুড়ের বাগান কি এমনি এমনি ছেল?” ভাবে ভুতো। মানুষ খাটত যেমন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, সৎও ছিল। অল্পে সন্তুষ্ট থাকত। শহুরে লোভের হাওয়া লাগেনি তখনও গাঁয়ের বাতাসে।

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

“তা বলে বেপদ-আপদ কি ছেলো না?” পাশ ফিরে শোয় ভুতো। বিড়বিড়ায় — “খুব ছেলো! কিন্তু তাতে কী? মাটি জল বাতাসের সাথি নিত্যি যুদ্ধু। সুখ মোদের জেবনে ফিঙা পাখি। উড়লিই হল। কিন্তুক এইসকল সরকারি হুজুত, রক্তচোষা ওত্যেচার তো ছেলোনি! কতা না, বাত্তা না, বলে, জমি দে! আরে বাপু, জলহীন মীন আর জমিহারা চাষা একই গোত্তরের। বাঁচে কি?”

দো ফসলি জমি এই গাঁয়ের। ধান হয়, আলু হয়। অথচ সরকারের জোর জবরদস্তি — এসব না কি বাঁজা জমি। এখানে মোটরগাড়ির কারখানা হবে। ফসলি জমির বুক খামচে তৈরী হবে ওই কারখানা। আর তাহলেই না কি ভুতোদের জীবন সুখে সুখে ভরে যাবে। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির সাথে লড়তে হবে না। না রইবে বাঁশ, না বাজবে বাঁশুরি! কিন্তু জন্মইস্তক যারা জমির ধুলোবালি মেখে লালিত পালিত, তারা কি না ক্ষেতিবাড়ি ছেড়ে হবে কলকারখানার কেজো পুতুল! মাটির স্পর্শ, ফসলের গন্ধ থেকে দূরে সরে থাকতে পারে কি চাষারা?

সরকারের এই অবিচার, লেঠেলদের হুজ্জতির বিরুদ্ধে কী করবে সহজ সরল মেহনতি এই মানুষগুলো? তারা আদতেই যে চাষি! গুণ্ডা তো নয়।

ভুতোর মাথায় মৃত্যুর ক্যারাপোকা দানা বেঁধেছিল অনেক দিন। সেই যে দিন খোকা ময়নার হাতে চ্যালাকাঠের বাড়ি খেয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ল। দোষের মধ্যে সে সেদিন বিদ্রোহ করে বাপকে বলেছিল, “তুই মিথ্যুক! ছোটা ভীম ব্যাগ দিব দিব বলি দিলি নে!”

ভুতো সদ্য ঝোড়ো কাক হয়ে আগুনতাত ক্ষেতের বরবাদি দেখে ঘরে ফিরেছিল। মাথা মুখ ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। ছেলের অভিযোগে মাথা টলে উঠে দাওয়ায় বসে পড়তেই কোথা থেকে বাজিনীর মত খ্যাংড়া হাতে ছুটে এল ময়না। দিল ধড়াধড় খোকাকে কষিয়ে। খোকার কান্নায় বোবা হয়ে গেল ভুতো। সেই রাতেই সে ঠিক করল, আর নয়। বাপের রাস্তায় হাঁটতে হবে তাকে। আর কোন রাস্তাই নেই। মায়ের মুখে কতবার শুনেছে ভুতো এই শেষ রাস্তার ঠিকানা।

ভুতোর বাপ আর পরানের ছিল গলায় গলায় দোস্তি। পরানের অবস্থাও সম্পন্ন। তিন ব্যাটা, এক মেয়ে। হেন রাত যেত না যে পরানকাকা তার বাপের সাথে রাতের হুঁকা টানতে আসত না তাদের উঠোন দাওয়ায়। দুই মেহনতি মানুষের সুখে দুখে কেটে যাচ্ছিল আটপৌরে জীবন।

গাঁয়ের সীমানা দিয়ে ওই যে বয়ে যাচ্ছে বামনি নদী, সেবার বর্ষায় লাগাতার বৃষ্টির জলে ফুলে ফেঁপে তার সে কী রাক্কুসি রূপ! প্রকৃতি যেন পাগলিনী। ছাড়েখাড়ে শেষ করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই সর্বস্ব। সেই অভিশপ্ত রাতের কথা গাঁয়ের মুরুব্বিরা আজও ভুলতে পারেনি। বামনি নিঃশব্দে পাড় ভেঙে সর্বনাশী রূপ নিয়ে এসে মিশল রক্তদহের বিলে। হু হু করে নিমেষে বিল নিল করাল সাগরের রূপ। খাবলে খেলো চাষিদের জমি, খেতি, বাড়ি, গোহাল — যা পেল সামনে। ঘরে ঘরে উঠল মড়াকান্না।

সব যখন শান্ত হল তখন দেখা গেল ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আগামী পাঁচ বছরেও পুরবে না। পরানের মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা সবই ঠিক হয়েছিল। সর্বস্ব হারিয়ে পাগলের মতন হয়ে গেল কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা। আর কোন উপায় না দেখে সে ঠিক করল টাকা রোজগারের একটাই পথ, আর তা হল আত্মহত্যা। সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ পাবে তার ছেলেরা। জমিজমা উদ্ধার হবে। মেয়ের সিঁথিতে মঙ্গল সিঁদূর উঠবে। অতএব এক কাকভোরে গাঁয়ের প্রান্তের অশ্বত্থের ডালে ঝুলে পড়ল পরান।

মৃত্যুর আগে পরান একমাত্র তার হরিহর আত্মা ভুতোর বাপকে বলে গেছিল তার মৃত্যুর রহস্যের কথা। পেঁচোয় পাওয়া ভূতের মতন স্থবির বসে শুনেছিল ভুতোর বাপ। বন্ধুকে আটকাবে কী সান্ত্বনা বাক্যে? তার নিজের তো সর্বস্ব গেছে। ঘরে অনাহার অর্ধাহার। মহাজনের দেনা, বুভুক্ষু, ক্লান্তি, অভিযোগ, হাহাকার।

সরকার মান রেখেছিল পরানের। ভয়াল বন্যাগ্রস্ত এলাকায় দেনার দায়ে চাষির মৃত্যু উপেক্ষা করতে পারেনি। আর তাতেই দূর অজানা দেশে পাড়ি দেওয়ার নেশা চেগে বসল ভুতোর বাপেরও। দিনক্ষণ পরিণতি না বুঝে সুঝে সেও পরিবার বাঁচাও প্রকল্পে রাতারাতি ঝুলে পড়ল কল্পবৃক্ষের ডালে।

সরকার দেখলে এ তো ভারি গ্যাঁড়া! দিলে কিছু সামান্য ভুতোর মা মঙ্গলার হাতে। মঙ্গলার তখন গলা ফাটিয়ে বুক বাজিয়ে শোকের সময়ও ছিল না। ক্ষেতের জল নাবলে স্বামীর পরণের শার্টখানা গলিয়ে কোদাল হাতে ছোট্ট ভুতোকে নিয়ে দৌড় দিলে মাঠে। সরকারি টাকায় গুনে গুনে বীজ ধান, দুটো গাই বলদ কিনতেই সে ফতুর!

রাত ভোর হয়ে আসে। ভুতো তক্তপোষ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ছেলেটা চোরের মার খাওয়ার পর থেকে কাছে আসেনা। মেয়েটাও গুমরে থাকে। ময়নার মুখে হাসি নেই, মাথায় তেল নেই, সিঁদূর আলতার লাবণ্য কবেই ফিকে হয়ে গেছে। আঙ্গনের তুলসি শুকনো। শ্রীহীন। জালনার গরাদ ধরে ভুতো ভোরের আলো দেখে। আজও কি বিষ্টি দেবে না ঠাকুর?

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

মায়ের কথা মনে পড়ে ভুতোর। “মাঠ আর কুঁড়ে বাড়ি, এই নিয়েই জেবনটা কাটায়ে দিল মা। কুনোদিন এট্টু শখ বলতি কিচু না। বিলাস বইলতে পান্তা ভাতে দুই খান লঙ্কাপোড়া আর তেঁতুলের ক্বাথ।” জলঝড়ের রাতে তাদের চালা ফুঁড়ে বৃষ্টি নামত। জায়গায় জায়গায় হাঁড়ি ধর রে, পাতিল আন রে। শোবে কই? তবু তারই মাঝে মা হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলত, “বিষ্টি ভালো করি দাও গো ঠাকুর! সবে চারাগুনো পুঁতিচি।”

হঠাৎ পিঠে নরম এক ছোঁওয়া পেয়ে চমকে উঠে ভুতো দেখে, ক্ষেন্তি। “কী রে, মা?” মৃদু স্বরে বলে ভুতো।

মেয়ে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদে — “বাবা, তুমি গলায় দড়ি দেবে না, কও! আমাগো কিস্যু চাই নে। আমি ভাইরে বলি দিব। তুমি নারু কাকা, হারু কাকার মতো করবে না কও!” ক্ষেন্তি ফুলে ফুলে হেঁচকি তুলে কাঁদে। ভুতো মেয়েকে জড়িয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। মাটিতে ধড়মড় উঠে বসে ময়না। চোখ ফাড় ফাড় করে বাপ মেয়েকে দেখে। চোখ জ্বালা করে জল আসে তারও। ‘কেন যে নক্ষ্মীছাড়া অবস্থা হচ্চে সম্সারের’, তা সে বুঝে উঠতে পারে না। এক একটা দিন শুরু হওয়া মানেই কি কেবল হতাশা, শ্রান্তি আর উদ্বেগ?

ভোরের বাতাসের মৌতাত নিচ্ছিল মঙ্গলাও। বছর দেড়েক হল সে ভিনদেশে এসেচে। কিন্তু হতচ্ছাড়া এই তেঁতুলগাছটার অমৃতফল তাকে মোক্ষ নিতে দিলে না। ডাঁসা ডাঁসা টোপা টোপা তেঁতুলের মোহে মঙ্গলা আটকে রইল এর ডালে পালায়, শাখায় পাতায়। আলাপ হল কত জনের সাথে। মুখপোড়া মিনসেটাও আছে। গলায় দড়ি দে মরে এখন কেস খেয়ে বসে আছে। আত্মহত্যা মহাপাপ! “নঁরক ঝেঁতি হঁতি পাঁরে তঁরে!” মুখের উপর বলাতে সেই থেকে কথা কয় না।

তেঁতুলগাছে মঙ্গলার রাজত্ব হলেও শাখিনী আর নিশাভূতিনী তার বড় প্রিয় দুই সখী। তিনজনে মিলে আলাপ হচ্ছিল সেদিন। “কঁথায় কঁথায় মিঁনসেগুলো আঁজকাল গঁলায় দঁড়ি দেঁ ঝুঁলতে নেঁগেচে। ইঁ কিঁ সাঁর্কাসের দঁড়ির খেঁলা নাঁ কিঁ রেঁ ড্যাঁকরারা? রিঁফুজিতে ভঁরি গেঁলো এঁধার। টেঁইমের আঁগেই সঁব আঁসতে নেঁগেচে, মোঁদের খাঁলাস হঁলোনি অঁতচ তেঁনাদের গুঁতায় মোঁদের জেঁবন জেঁরবার!”

মঙ্গলার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়েছিল নিশাভূত। ইশারা প্রশস্ত। মঙ্গলা অপরাধী গলায় স্বীকার করেছিল যে ভুতোর মনে আজকাল মৃত্যুচিন্তা ঘোরাফেরা করছে বই কি! শাখিনী মঙ্গলাকে বলেছিল, “তঁর ভাঁলোর তঁরে কঁইচি। ব্যাঁটারে সঁমঝা। এঁধারে ফাঁটাফুটি অঁবস্থা। তঁর উঁপর পঁসন্ন হঁবেনি কেঁউ। এঁক পঁরিবার থেঁ তিঁন তিঁনডে দঁখলদার!”

কাঁচুমাঁচু মুখে মঙ্গলা বলেছিল, “উঁপায় কঁওন দিঁদি! ব্যাঁটা মোঁর জাঁইত চাঁষা। লঁড়তি ডঁরায় নেঁ বাঁপের পাঁরা। কিঁন্তুক মুঁখপোড়া গুঁখেকো ন্যাঁতাগুঁলার গুঁণ্ডামি সঁয় নাঁ।”

অনেক ভেবে তিনসখিতে গোপন মন্ত্রণায় বসে। সেই রাতে ভুতো মায়ের সাথে সাক্ষাতে গেলে মঙ্গলা ভুতোরে বলে, “বাঁপডা, তঁরে এঁট্টা কঁতা কঁই। এঁই নাঁড়ু হাঁরু ঝেঁ কিঁত্তিটা কঁইরল, তাঁতে কাঁর কিঁ এঁলো গেঁলো? তাঁদের বৌঁ দুঁইডা মাঁছি মাঁরতাসে। সঁরকার থিঁকা এঁট্টা কাঁনাকড়িও তোঁ দেঁওন নাঁই। বাঁপ, এঁ যুঁগির সঁরকারও ত্যাঁদোড় কঁম নাঁ। মঁরতি ঝঁদি হঁয়, বিঁজ্ঞাপন দেঁ মঁর।”

ভুতো শুনে হাঁ। আজ দেড় বছর ধরে প্রতি রাতে সে মাকে দেখতে এই তেঁতুলতলে আসে। মঙ্গলা দেহ ছাড়ার পর একমাত্র তার ব্যাটারে অশরীরী রূপ দেখিয়ে তার উপস্থিতি কায়েম করেছিল। ভুতোও সানন্দে মেনে নিয়েছিল তার ভিটের কোনে মা’র এই আত্মিক উত্তরণটুকু। তার বিশ্বাস ছিল বিপদে আপদে মা আছে। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে মা’র ভৌতিক মস্তিস্কে ভীমরতি ধরেছে।

“বিজ্ঞাপন? কী কও ঝা তা?” তেতো মুখে বলে ভুতো। “ক্ষেন্তিডা আইজ জাঁকরা ধরি কানচে। আর তুমি কও আমি ঢাক ঢোল শিঙা ফুঁকে গলায় দড়ি দিতি আসবো?”

মঙ্গলা শান্ত সুরে স্পষ্ট কথা বলে। “বাঁপডা, তঁর মঁরা চঁলবেনি। তুঁই মঁলে আঁমি এঁধেরে মুঁক দেঁকাতে পাঁরবুনি। এঁক পঁরিবারের তিঁনজন দঁখলদার!”

ভুতো ফুঁসে উঠে বলে, “আইচ্ছা! আমার প্রাণের থে তোর মান বড়ো? তা’ তুই-ই বল না কেনে, আমি জেবনডা রাখবো কী করি! নিজি না মরি, সরকারি গুণ্ডা তো মারবেই বটে!”

মঙ্গলা পরামর্শ দেয় ভুতোকে। খলবল খলবল তেঁতুল পাতা নড়ে। শন্ শন্ শন্ শন্ — রক্তদহ বিলের হাওয়া ওড়ে।

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

পরদিন সকালে ভুতো পঞ্চায়েত আপিসে গিয়ে রীতিমত আপিল করে আসে যে সে মরবে। সামনের অমাবাস্যায় অর্থাৎ আজ থেকে ঠিক পাঁচদিন পর। স্থান — তার ভিটেবাড়ির তেঁতুলগাছ। সে পঞ্চায়েত প্রধান, গ্রাম মহাজন, বড় চাষি, হোমড়া চোমড়াদের নেওতা দিয়ে আসে তার মৃত্যুর লাইভ শো দেখতে আসার জন্য। খবর চাউর হয়। খরায় আক্রান্ত এই গাঁয়ের এক চাষির আত্মহত্যার লাইভ শো? ওয়াও বলে কাগুজেওয়ালারা নিমেষে হাইওয়েতে গাড়ি ছোটায়। কাঁছা কোঁছা সামলে বিরোধীদল একজোট হয়ে রওনা দেয়।দেখ না দেখ, ভুতোদের চালাঘরের সামনে দামড়া দামড়া ক্যামেরা হাতে টিভিওয়ালা, মাইক হাতে কাগজওয়ালা আর বিরোধীরা এসে জুটে যায়। ভুতোর আঙনে বাঁশ পড়ে। ম্যারাপ বাঁধা সারা। মওকা বুঝে কেলো তার চায়ের দোকান চণ্ডীমণ্ডপ থেকে সোজা তুলে আনে ভুতোর বাড়ির সামনের রাস্তায়। তার সাথে জোটে কানু। তার আবার মিষ্টির দোকান। দেদার জিলিপি সিঙ্গাড়া ভাজা হতে থাকে। এক নিমেষে গোটা গণ্ডগ্রামটা দেশের মানুষের কৌতুহলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়।

(Illustration courtesy: Saddahaq)

সরকার দেখলে এ তো মহা গ্যাঁড়া। শেষে এক চাষার হাতে জীবন যৌবন ধন মান যাবে? কৃষিমন্ত্রীর তলব হল। মহামন্ত্রী তাঁর হিমঘর আপিসে বসে শুধোলেন, "তবে যে বলেছিলেন ওখানকার জমিগুলো বাঁজা মেয়েছেলে? এখন তো শুনছি ওখানে না কি ধান-টান হয়, আলু-টালু হয়?"

কৃষিমন্ত্রী নিজেই কি ছাই জানেন কোথায় আলু-টালু হয়। তিনি পাতে গরমাগরম আলু পরোটা পেলেই সুখী বরাবর। আমতা আমতা করে বললেন, "আজ্ঞে স্যর, বিষ্টি হচ্ছে না তো! তাই জমিগুলো অলমোস্ট মরা।"

মহামন্ত্রী দাবড়ে ওঠেন — "ক্যানো হচ্ছে না বিষ্টি? অ্যাঁ? ক্যানো?"

কৃষিমন্ত্রী তুতলে বলেন, "আ-আজ্ঞে আমি খবর নিচ্ছি স্যর!" যেই পাছু ফিরেছেন মহামন্ত্রী হাঁকেন — "ব্যাটা চাষাটা চায় কী?"

কৃষিমন্ত্রী তাচ্ছিল্যে বলেন, "আজ্ঞে স্যর, ক্ষতিপূরণ! চাষের জমি সরকারকে দেবে তার জন্য, আর প্রাণ দেবে তার জন্যও!"

"মামদোবাজি? কে চায় ওর প্রাণ? যান! এক্ষুনি বেরোন। সব ব্যবস্থা করে জীয়ন্তে ধরে আনুন চাষাটাকে আর ঢুকিয়ে দিন জেলে। যান, যান!"

"ইয়েস স্যর!" থপ্ করে হাতী পা জোড়া করে কৃষিমন্ত্রী গিয়ে ওঠেন গাড়িতে। সাদা গাড়িতে লাল ধুলো মাখিয়ে অকুস্থলে পৌঁছে দেখেন অবস্থা সঙ্গীন। চাষাটা সোজা গিয়ে তেঁতুলগাছের ডালে আস্তানা গেড়েছে। ওর সামনে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লেগেছে একটা

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

বৌ আর একজোড়া বাচ্চা। মচ্ছর সাংবাদিকগুলো ভনভন করে উড়ছে ওদের চারিপাশে। বিরোধীগুলো ঘাগু মাল। ফাঁদ পেতে জাল বিছিয়ে বসে আছে। একটা ভুল চাল মানে সব শেষ!

কৃষিমন্ত্রী গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা গেলেন আগে সরকারি দুলালদের ডেরায়। সবকটাকে মুহূর্তে সটকে পড়ার পরামর্শ দিয়ে গুটি গুটি হাজির হলেন ভুতোর ডেরায়। তাঁকে দেখে 'মুর্দাবাদ মুর্দাবাদ' বোল উঠল। থোড়াই কেয়ার ভাব দেখিয়ে সটান গেলেন ভুতোর সামনে। হাত জোড় করে বললেন, "ভুতোবাবু! এটা আপনি কী করছেন? আমরা শান্তিপূর্ণভাবে কথা বলি? আপনি প্লীজ্ গাছের ডাল থেকে নীচে নেমে আসুন!"

ভুতো একগাল হেসে বলল, "বাবু, আমারে 'বাবু-আপনি-আজ্ঞা-পিলিজ' এইসব কইয়েন না। গালি মনে হয়! তাছাড়া কথা কওনের তো কিচু নাই। আপনি আমার মিত্যুর ক্ষেতিপূরণডা আমার বৌরে দিয়ে দ্যান, আমি পরশু ঝুলি যাচ্চি।"

মন্ত্রী গরমে বলেন, "ঝুলি যাচ্চি? বললেই হল? এটা কি ট্র্যাপিজের খেলা?"

ভুতো দাঁত বার করে হাসে। "খেলা তো আপনারা খেলিছেন বাবুরা। গুণ্ডা লেলিয়ে দিচেন আমাগো পোঁদে। জবরদখল নিতি চান এই দো ফসলি আবাদ জমি। ঝদি নিজি মরি তো বীরের মতো মইরব। গুণ্ডার হাতে কাটা কুত্তার মতো পরানডা ক্যানো দিব? তা বাদে, জেবন দিব, জমি দিব — ফালতু? দাম দিবেন না?" পেছনে স্লোগান উঠল, 'ভুতোর কথা হক কথা / ঘরে ঘরে চাষির কথা।'

কৃষিমন্ত্রী দেখলেন স্বখাত সলিলে ডুবছেন। সুর পালটে বললেন, "আমাকে মহামন্ত্রী পাঠিয়েছেন আপনাকে সসম্মানে রাজধানীতে নিয়ে যেতে। আপনাদের সমস্যা আমাদের সমস্যা।"

ভুতো হাত দেখিয়ে বলল, "থাইক। আপনাগো রাজধানী আমার দরকার নাই। চাষা তো, ভাবেন আমরা বুঝি বোকার হদ্দ। আপনাগো গুণ্ডার মাইর খাইয়া হারু নারু সর্বপেত্থম জমি বেচি দিল। একডা কড়ারও পায় নাই। গলায় দড়ি দিয়ে ওপারে গিয়ে উঠল। আরো খপর আচে। জমি লিখাপড়া করি দু' চারজন রাজধানীর ইষ্টিশানের ভিখিরি হইচ্চে। জাত চাষারে আপনারা ভিখিরি বানাইসেন! বাহারে বাহা! কত্তা, চাষি ঝদি গরিব হয়, পুরা দ্যাশই থালে গরিব। আমাগোরও বুক আচে গো কত্তা। সেই বুকে মান-মমতা, সুখ-দুঃকু আচে। কোলের ব্যাটায় মিথ্যুক কয়, কারন তারে কিসু দিতি পারি না। দিব দিব করি। মোদের ঘরে মোচ্ছব লাগে, দায় দায়িত্ব আচে। কিন্তুক ক্ষ্যামতা নাই! মোদের দুবেলা খাওন লাগে, কাপড় তেল সিঁদূর লাগে, জোটে না!"

ময়না গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে। "ওগো, কিচ্চু লাগবেনি, তুমি নেইমে এসো।" কেঁদে কেঁদে ধুলোয় ঘুমিয়ে পড়েছে ক্ষেন্তি। খোকা সভয়ে নিশ্চুপ।

ভুতো বলে, "ময়না, কাঁদবিনি। এ মোদের হকের ট্যাকা। পকিতি মা লাথি মারে আবার বুকেও টানে। কিন্তুক এই বাবুদের লাথি ঝ্যাঁটায় পরানডাই চৌচির হয়। রাইত দিন পিঠ পুড়িয়ে এই এনাগো আমরা খাওয়াই। অন্নদাতা মোরা। কিন্তুক ঝানবি, এদের চোকে মোদের লাগি কুনো মান নাই। এরা হাসাহাসি করে রে ময়না আমাদের দেখন, খাওন, বলন নিয়া। বলে 'চাষার মতো দ্যাখতে, চাষার মতো খায়, চাষার মতো কতা কয়'। এইসব! বাবু গো, আপনে তো মোদের মারতিই যমদূতদের পাঠায়েচ। তা হলি আমার আত্মহত্যায় আপত্তি ক্যানো তুলচ? খরায় আমার পশু যায় যায়। বীজ ধান খড় হল। আমরা তো মরিই আচি। হুই যে দালাল ব্যাট!" ভুতোর আঙুল নির্দেশ করল এক চালিয়াত গোছের লোককে। সে পত্রপাঠ মুখে রুমাল চাপা দিল।

"শালার ব্যাটা বলে কার্ডে ট্যাকা নে। চেকে ট্যাকা নে। সি সব কী বস্তু তা জানিনে বাবু। মহাজন গলায় গামছা পোঁচ দেয়, বলে বীজ ধান দিব, কড়া সুদ দিবি। আপনারা কন — জমিই দে দে, মজুরগিরি কর। বাবু, মজুরগুরি আমরা কত্তে জানিনি। মোরা চাষা, জমি মোদের মা!"

একটানা কথা বলে ভুতো থামে। পাশা পাল্টে যায়। কৃষিমন্ত্রী দেখেন অনেকেই চোখের জল রুমাল, আঁচলে মুছতে লেগেছে। তিনি গলা খাঁকড়ে বলেন, "ভুতোবাবু, জমিতে কী আছেন বলুন তো? জমি মানে সর্বনাশ, মানে অনিশ্চয়তা। আজ অতিবৃষ্টি, কাল অনাবৃষ্টি। কিন্তু কারখানা? সে তো মশাই বুক চাট্টান করে খাঁড়া থাকবে, অ্যাঁ? হেঃ হেঃ, কী বলেন? আর সেখেনে আপনার কাজটাও যাতে পাকা হয়, মোটা মাইনে হয় তার মুচলেকা আমি দোবো!"

ভুতো অবাক হয়ে সমবেত জনতার মধ্যে হেঁকে বলে, "ওরে ও নফর, ও কেলো, ই দেখ বাবুর কত! আপনে কি ক'ন কর্তা? চাষের জমি চষে শুদু আমরা বাঁচি নে! মোদের সাথে বাঁচে পিথিমি। মাটির নীচে জল আচে। সেই জলের আর এক নাম জেবন। আমাদের মেয়ে পড়ে, আমি শুনিচি। আমি দেকিচি হুজুর, সেই জলে কত্ত পোকা মাকড়। জীব তো তারাও? কিচু আবার চাষার বন্ধু

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com

পোকামাকড়ও বটে। কত পাখি আসে। সারস বক! জমি না থাকলি ওদের কী হবে? পকিতির চক্কর চলতিচে, বাবু। তাতে হাত দোওয়া কি ভালো?”

দাঁত কিড়মিড় করেন কৃষিমন্ত্রী। ব্যাটার কাছে এখন কি না সায়েন্স পড়তে হবে! কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, টাকে দুটো টকাটক ইমলি খেসে পড়াতে অবাক হয়ে তাকিয়ে ভাবলেন — হাওয়া নেই, দোলা নেই, কোত্থকে এল একজোড়া তিন্তিড়ির ফল?

ভুতোর চোখ পড়তে সে হেসে বলল, “রেখি দ্যান বাবু! আমার মায়ের ভালোবাসার দান। এই গাচেই থাকেন। এখুনো আছেন। তিনি, তাঁর দুই সখী শাখিনী আর নিশাভূত। নিশাভূতিনীর সব ভালো, ক্যাবল ঝারি মনে ধরে, তারি নিয়্যি ছাড়ে। মনে হয়, আপনারে তাদের ভালো লেগিছে।”

কৃষিমন্ত্রীর হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা লাগল। এই খরায়, তীব্র তাপে এত শিরশিরানি কোত্থেকে আসে? তবে কি সত্যি সত্যি এই চাষাটার মা ভূতিনী হয়ে দোল খাচ্ছে ওই গাছে?

কৃষিমন্ত্রী পেছুতে থাকেন এক পা, দু’ পা। ভুতো বলে, “বাবু, ভয় নেই! ভূত গুণ্ডা নয় ঝে বিনি মতলবে আপনারি কিলিয়ে কাঁটাল পাকাবে! তাদের আপনারে ভালো লাগলি দুটো কতা কইতে আসতে পারে তার বেশী কিচু নয়। আপনি কত কষ্টে গাড়ি হাঁকিয়ে এদ্দুর এয়েচেন আমারে কারখানার দারোয়ান করতি, আমার মা আপনারে অসম্মান করতি পারে? জমি আমার আর এক মা, হুজুর! তারে আমি আইজ বেচি দিব। তারপর এই ফাঁসি কাঠে ঝুলি যাবো। শুদু ক্ষেতিপূরণের ট্যাকাটা আপনি ময়নারে দিয়া দেন। নইলে নিশাভূতিনীরে আমি আপনারের ভালোবাইসতে আটকাতে পারবো না, হুজুর!”

কৃষিমন্ত্রী এত কাল কম মানুষকে গরু বানাননি। কিন্তু ভূতের সাথে মস্করা? টিভির খবরওয়ালারা বরাবর কোমর বাঁকিয়ে ক্যামেরা বাগিয়ে ধরে আছে। তাদের ধারণা ভুতোর সাথে দু’একটা ভূতিনীকে যদি ধরা যায় তাহলে সোনায় সুহাগা!

বিরোধীরা হঠাৎ স্লোগান তুলল, “নিশাভূত জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!”

তেঁতুলগাছে যেন শিহরণ খেলে গেল। লজ্জায় বেগুনী নিশাভূত মঙ্গলার কোলে মুখ লুকিয়ে বলল, “এঁত্তো সঁম্মান তঁর ব্যাঁটায় দিঁলো রেঁ দিঁদি! জীঁয়ন্তে কেঁউ দেঁয়নি!”
মঙ্গলা আপ্লুত হয়ে স্থান কাল পাত্র ভুলে শরীরী রূপ ধরে ভুতোর সামনে আশীর্বাদ দিতে দাঁড়াতেই কাটা কলাগাছ হয়ে পড়ে গেলেন কৃষিমন্ত্রী। ক্লিক্ ক্লিক্ ক্লিক্ — ঝাঁঝিয়ে উঠল ফ্লাশের আলো। জিভ কেটে মঙ্গলা চোখের পলকে ভ্যানিশ!

সবাই যখন ‘জল দে! জল দে!’ করে ব্যস্ত হয়ে কৃষিমন্ত্রীর চারপাশে হাঁকাহাঁকি করছে, কেউ খেয়ালই করেনি কখন মাথার উপর আকাশ মসীকৃষ্ণ রূপ নিয়েছে। প্রথমে ধীরে তারপর অঝোরে অমৃতধারা পড়তে লাগল। ভুতো একছুটে তেঁতুলডাল থেকে লাফিয়ে নামল উঠোনে। ময়না ছেলেমেয়েদের ধুলো থেকে তুলে স্বামীর সাথে আনন্দে আত্মহারা।

কাউকে কিছু করতে হল না। বৃষ্টির জল গিলে কৃষিমন্ত্রী হাঁচোড় পাঁচোড় করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কাঁপা স্বরে হাত জোড় করে বললেন, “ভুতোবাবু, আমি সবার সামনে কথা দিয়ে গেলাম। আপনার জমি মাটি আর মা আপনারই থাকবে। আর আপনি জমির জন্য যা ক্ষতিপূরণ পেতেন, তা পাবেন চাষের কাজে লাগাতে। আমরা ভুলেও এই জমির দিকে ট্যারা চোখেও চাইব না। প্রমিস!”

তেঁতুলতলায় অশরীরী শ্বাস প্রশ্বাসের দোলা লাগল। আর কেউ না শুনতে পেলেও কৃষিমন্ত্রী স্পষ্ট শুনলেন — “নিশাভূতিনী খুশ্ হুয়া!”

নতুন লেখা মিস্ করবেন না।
ই-মেলে লেখা পাওয়ার জন্য ক্লিক্ করুন এখানে!

© 2017 Maitreyee Kumar/Bong Dhong Dot Com